দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও রূপকথার আনন্দ-জগৎ

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

একদা বাল্য-শৈশব ছিল রূপকথাময়। কল্পলোকের গল্পকথার সে-জগতে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দই ছিল আলাদা। এখন সময় বদলেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। গল্প বলার মানুষজনই বা কোথায়! একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেচুরে একশা। ফ্ল্যাট বাড়ির ছোট্ট ঘরে আর যাই থাক রূপকথা নেই। কঠিন বাস্তব, ঘোরতর ব্যস্ততা। কখনো বা টানাপোড়েন-সংঘাতের অন্য জগৎ।

সে-জগতেও কোনোক্রমে, ফাঁকফোকর গলে যদি রূপকথা ঢোকে, সহসাই ঘরের চেহারা বদলে যায়। ঘরের ছোট্টোটি, যার মুখে ছিল আষাঢ়-মেঘ, তার মুখ আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে। রূপকথার এমনই মহিমা, অমোঘ শক্তি। এই মহিমা-শক্তি হঠাৎ করে জেগে ওঠেনি। আগেও ছিল, এখনও আছে। চিরায়ত-চিরকালীন।

তখনও লিখিত রূপ পায়নি, সাহিত্য ছিল পুরোপুরি মৌখিক। ছড়িয়ে পড়ত মানুষের মুখে মুখে বহুদূর বিস্তৃত, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে পড়ত দেশের বাইরেও। মুখে মুখে ছড়ানোর ফলে অনেক সময় মূল গল্প পাল্টে যেত। কখনো ওদেশের গল্পে মিশে যেত এদেশের গল্প।

মুখের গল্প লিখিত-রূপ পেয়েছে ঢের পরে, আধুনিককালে। ওদেশ থেকে মুদ্রণ যন্ত্র এসেছে, ছাপাখানা তৈরি হয়েছে, শিক্ষিতজন অনুভব করেছেন ছড়ানো গল্প সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, তারপর সংগৃহীত গল্প মুদ্রিত হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল সময়-সাপেক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদি।

লোকসাহিত্যের যে ছড়ানো পরিসর, তা ছড়া-ধাঁধা বা লোককথা-লোকগান, যা-ই হোক না কেন, সবই সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রথমে প্রচারিত হত। মুদ্রণরূপ পেয়েছে পরে। রূপকথার ক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছে। কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। গল্প ছিল, অথচ 'রূপকথা' শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিককালের রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র (১৮৬৫) সমালোচনাকালে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

অনেকেই মনে করেন, 'উপকথা' কালক্রমে রূপকথা হয়েছে। যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সুকুমার সেনের ধারণা, 'রূপকথা' শব্দটি এসেছে 'অপূর্ব কথা' থেকে। শব্দটি না থাকলেও গল্প ছিল। রূপকথা বলতে যা বোঝায়, তেমন গল্পের অভাব ছিল না। গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গোলাপের গোলাপত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। 'রূপকথা'র ক্ষেত্রে তেমনই হয়েছে। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, রূপকথার গল্প সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল। হোক

না পুরোনো, রূপকথা 'রূপ' হারায়নি। ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে যায়নি, ঐশ্বর্যে ঘাটতি পড়েনি।

রূপকথার গল্পে লক্ষ করা যায় রাজারাজাড়াদের প্রাধান্য– তাঁদের পরিবার জীবন থেকে শুরু করে রাজ্যপাট। শুধু রাজকাহিনি নয়, বণিকসমাজ থেকে রাক্ষসসমাজ, কী নেই। এমন রূপকথাও আছে, যেসব আখ্যানে রয়েছে প্রাকৃতজন বা পশুপাখির প্রাধান্য। রূপকথার গল্পে মিশে আছে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা'-র প্রভাব পড়েছে। সে-প্রভাব কখনো তেমন প্রকট নয়। ভিতরে, গোপনে রয়ে গেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের প্রভাব যেমন আছে, তেমনই আছে আরবদুনিয়ার গল্প। খুঁজলে আলেফলায়লা বা ওই জাতীয় ফারসিরচনার প্রভাবও পাওয়া যাবে। এ প্রভাবও প্রকট নয়। প্রাচীন সাহিত্যের বা ফারসি সাহিত্যের প্রভাব যা-ই থাক না কেন, চিরায়ত কিছু বোধ আছে, গল্পে গল্পে সে-বোধ ক্রিয়া করেছে। বাৎসল্য-সৌহার্দ্য বাদ দিয়ে জীবন হয় না। রূপকথায় যতই কল্পনার আধিক্য থাক, শেষ পর্যন্ত শোনা গেছে 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি'। ফলে হৃদয়স্পর্শী বাৎসল্য-সৌহার্দ্য এসব গল্পে সহজলভ্য। রয়েছে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার কথাও।

কল্পকথার গল্প শুধুই যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের কথা বলে, তা নয়। সামগ্রিকভাবেই মহতী বার্তাবহ। জীবনের নানা স্তরে সে-বার্তা কাজে লাগে, পথ দেখায়। জীবনের সূচনায়, শৈশব-বাল্যে রূপকথা প্রায়শই আনন্দ বার্তা আনে। করে তোলে কল্পনা-প্রবণ, প্রকৃত অর্থেই সেই দিনগুলি হয়ে ওঠে নানা রঙের বর্ণময়।

শৈশব-বাল্যে মুগ্ধতা নিয়ে রূপকথা শোনেনি, আদৌ এমন কেউ কি আছে! রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথও শুনেছেন। প্যারী ও শঙ্করী দাসীর মুখে রূপকথার গল্প শোনার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে পরিণত-বয়সেও জ্বলজ্বলে ঔজ্জ্বল ছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের বুঝিয়েছিলেন লোকসাহিত্যের গুরুত্ব। মনে হয়েছিল তাঁর, 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি'। প্রচলিত ছড়া সম্পর্কে শুধু নয়, সামগ্রিকভাবেই তিনি এমন ভাবতেন। ছড়িয়ে থাকা লোকসাহিত্য সংগ্রহে ও একত্রীকরণে তাঁর আন্তরিকতা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। তিনি নিজে মন দিয়েছিলেন ছড়া-সংগ্রহে, পত্নী মৃণালিনীকে দিয়েছিলেন রূপকথা-সংগ্রহের দায়িত্ব। মৃণালিনী দেবী সংগৃহীত রূপকথা নিজের মতো করে লিখে রাখতেন একটি খাতায়। সেই খাতা থেকেই অবনীন্দ্রনাথ 'ক্ষীরের পুতুল'-এর কাহিনি-উৎস গ্রহণ করেছিলেন। এই তথ্যটি অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন। তাঁর 'শিশুদের রবীন্দ্রনাথ' নামাঙ্কিত এক রচনায় আছে এ তথ্য।

'ক্ষীরের পুতুল' ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বাল্যগ্রন্থাবলী' সিরিজের তৃতীয় বই। প্রথম বইটিও ছিল অবনীন্দ্রনাথের। পরিকল্পিত এই সিরিজের প্রথম বইটি লেখার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর 'রবিকাকা'। প্রথমে অবনীন্দ্রনাথের মনে পারা, না-পারা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংশয় ছিল। দ্বিধা ধুয়ে মুছে শেষে লিখেও ফেলেছিলেন। লিখে সবার

আগে দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সে বইয়ের নাম 'শকুন্তলা'।

ঠাকুরবাড়ির 'বাল্যগ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় বইটি ছিল রবীন্দ্রনাথের, উপেন্দ্রকিশোর চিত্রিত 'নদী'। তৃতীয় বই 'ক্ষীরের পুতুল' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬-তে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ক্ষীরের পুতুল' প্রকাশের পরেই রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন বিস্তৃত পরিসরে সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন, এ কাজ শুরু হয়েছিল অবশ্য ঢের আগে। কোনো বঙ্গসন্তানের হাতে নয়, ভিন্‌দেশি এক সাহেব এ কাজ শুরু করেছিলেন। আমরা উইলিয়াম কেরীর কথা বলছি। তাঁর 'ইতিহাসমালা'য় দেড়শো গল্প গ্রন্থিত হয়েছিল। নানা ধরনের গল্প। অন্তত আটটি গল্প ছিল রূপকথাজাতীয়। কোনো কোনো গল্পে রূপকথার চেনা আদলও পাওয়া যায়।

কেরীর অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল না রূপকথা সংগ্রহ। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গল্প-সংগ্রহ সম্পাদনা করেছিলেন। সংগৃহীত গল্পের মধ্যে আলাদা করে চিহ্নিত না করলেও রূপকথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১২-তে। এরই প্রকাশের ষাট বছর পর সচেতনভাবে লোকায়ত গল্প সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহের কাজটি যাঁর হাতে সম্পাদিত হয়, তিনিও ছিলেন ভিন্‌দেশি। ১৮৭২-এ ডি-এইচ ড্যামান্ট বাইশটি উপকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন 'Antiquary' পত্রিকায়। সংগৃহীত একটি গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পরী। রূপকথাকে ইংরেজিতে বলা হয় Fairy Tale। রূপকথা মানে শুধুই পরী নয়, বিষয়টি আরও বিস্তৃত। ড্যামান্টের সংগ্রহ করা গল্পসমূহের একটি যে ছিল বিশুদ্ধ রূপকথা, তা নিয়ে অবশ্য দ্বিমতের অবকাশ নেই। সমকালে ড্যামান্টের পাশাপাশি আরেক সাহেব লোকগল্প সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর নাম ডেন্টন। ড্যামান্ট ও ডেন্টনের এই প্রয়াসে প্রাণিত হয়েছিলেন এক বাঙালি মিশনারি, তিনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। তাঁর সংগৃহীত গল্প নিয়ে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় 'Falk Tales of Bengal'।

বাংলা লোককাহিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন লালবিহারী। বাংলার লোককাহিনী বাংলা ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় বান্ধব। সংগৃহীত গল্পগুলি দু'টি বইয়ে সংকলিত করেছিলেন তিনি। একটি বইয়ের নাম 'রাক্ষস খোক্ষস' (১৮৯৭), আরেকটি 'ভূত-পেত্নী' (১৯০২)। বলা যায়, শুধু সংগ্রহ নয়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলা ভাষায় প্রচলিত রূপকথা-লোককথার পুনর্লিখন শুরু হয়েছিল। বাংলা ভাষাতে সংগৃহীত গল্পের লিখিত-রূপ দেওয়া কত জরুরি, তা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। 'রাক্ষস-খোক্ষস' বইয়ের ভূমিকায় লালবিহারী দে সংগৃহীত গল্পগুলি কেন ইংরেজিতে লিখেছিলেন, নিজের মতো করে তিনি তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ভূমিকার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "কয়েক বৎসর পূর্বে রেভারেন্ড লালবিহারী দে মহোদয় তাঁহার (Folk tals of Bengal) 'ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল' নামক পুস্তকে প্রাচীন কালের এই

গল্পগুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তিনি সভ্যতাভিমানী বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইবেন না ভাবিয়া বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রতি আর নাসিকা কুঞ্চিত করি না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আর ভয় নাই। তাই সাহসে নির্ভর করিয়া লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইলাম।"

বাঙালির গল্প সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় লিখতে ব্রতী হয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চমৎকার এক কাজ করেছিলেন। কেন তাঁর এই প্রয়াস, কর্ম-তৎপরতা, সে-বিষয়েও তিনি কিছু কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন। ভূমিকাটি পড়তে গিয়ে মনে হয়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তো আজকের ছোটোদের দুর্দশার কথাই শুনিয়েছিলেন। তাঁর 'রাক্ষস খোক্ষস' বইয়ের ভূমিকাটি শুরু হয়েছে এভাবে: "ছেলেরা গল্প ভালবাসে, কিন্তু গল্প শুনাইতে বুড়াবুড়ি আর মেলে না। আজকালকার ঠাকুরমা ঠাকুরদাদার নাতি নাতিনীদের লইয়া আর সেকালকার 'ছেলেভুলান গল্প' শুনাইতে ভালবাসেন না। কাজেই কালের আবর্ত্তন স্রোতে সেই গল্পগুলি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া 'রাক্ষস-খোক্ষস' বাহির হইল, কিন্তু ইহাকে ছেলেরা ভয় না করিয়া ভালবাসিবে।" এমন গল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করলেন, যা ভয়ের নয়। রাক্ষসদের ভালোবাসতে শেখানোর এই মহত্তর ভাবনা পরবর্তীকালের সংগ্রাহক ও লেখকদের স্পর্শ করেছে।

লোকায়ত রূপকথা উদ্ধারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আশুতোষ সচেতন করলেন। এর ঢের আগেই ছোটোদের মধ্যে রূপকথার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাগরপারের সেরা রূপকথার (হ্যানস অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা) বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। অ্যাণ্ডারসন তখনো বেঁচে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ পাঠকনন্দিত হয়েছিল। এই সমাদর-স্বীকৃতি শিবনাথ শাস্ত্রীকেও অ্যাণ্ডারসনের গল্প অনুবাদে উৎসাহিত করেছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী ছোটোদের নিয়েও নিরন্তর ভেবেছেন। তাদের কথা ভেবে প্রকাশ করেছিলেন 'মুকুল' পত্রিকা। 'মুকুল'-এর গোড়ার দিকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত অ্যান্ডারসনের অনূদিত গল্পগুলি একত্রিত করে 'উপকথা' নামে বই বেরিয়েছে অবশ্য অনেক পরে। যে বছর দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশিত হয়, সে-বছর ১৯০৭-এ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমকালে জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তের 'উপকথা'ও প্রকাশিত হয়েছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহের, সংগ্রহান্তে ছোটোদের মতো করে লিখে ফেলার যে-কাজ শুরু করেছিলেন, তা পরিপূর্ণতা পায় দক্ষিণারঞ্জনের কলমে। অনেক প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের পর সংগৃহীত গল্পগুলি একত্রিত করে 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশের পর দক্ষিণারঞ্জনকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। রূপকথায় জোয়ার এসেছে। তিনি 'ঠাকুরদার ঝুলি' ও 'ঠানদিদির থলে' নামে আরও দু'টি বই লিখেছেন। এই বই দু'টিও সংগৃহীত গল্পের সংকলন। আপাতভাবে সংগৃহীত গল্পের সংকলন হলেও রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। একসময় 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠানদিদির

থলে' বই দুটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের পাঠক্রমেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

দক্ষিণারঞ্জনের সাফল্যে, রূপকথার জনপ্রিয়তায় প্রাণিত হয়ে এ জাতীয় বই আরও লেখা হয়েছে। নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে সংগ্রহের কাজ। প্রকাশিত হয়েছে চণ্ডীচরণ গুপ্তের 'ঠাকুমার রূপকথা', কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'ঠাকুরদাদার রূপকথা', শ্যামাচরণ দে-র 'বঙ্গের রূপকথা', সত্যচরণ মিত্রের 'ঠাকুমার ঝোলা' ও শিবরতন মিত্রের 'সাঁজের কথা'। শিশুসাহিত্যের জগতে সত্যচরণেরও পরিচিতি ছিল। নিয়মিত ছোটোদের জন্য লিখতেন, 'খোকাখুকু' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। গবেষণাকর্মে কৃতবিদ্য শিবরতন সমধিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন লোকায়ত গল্প সংগ্রহে ও পুনর্লিখনে। তাঁর হৃদয়গ্রাহী গদ্য ভাষায় চমকিত হতে হয়। দুঃখের বিষয় শিবরতন মিত্রের 'সাঁজের কথা' সেভাবে আলোচনার আলোয় আসেনি।

আলোচনার আলো সবটুকুই বুঝি দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র উপর। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিশ্চিতভাবে এ বইয়ের গুরুত্ব বাড়িয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জনের লেখাতেও যাদু আছে। নিজস্বতায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। সে-ঔজ্জ্বল্য সময়ের ব্যবধানেও ফিকে হয়ে যায় নি।

দক্ষিণারঞ্জনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তাঁর পিসি রাজলক্ষ্মী। পিসিমার কাছে, টাঙাইলের দিঘাপতিয়ায় না গেলে তিনি, অপরূপরতনের সন্ধান পেতেন কি, 'ঠাকুরমার ঝুলি' লেখা হতো কি? এমন অনেক 'কি', বিবিধ জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগে।

অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা জেলার সাভারের অদূরে উলাইল গ্রামে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম (১৮৭৭, ১৩ এপ্রিল), বেড়ে ওঠা। সম্ভ্রম জাগানো বংশ কৌলিন্যের অধিকারী তিনি। রাজা প্রতাপদিত্যের জামাতা রাজা উদয়নারায়ণের বংশধর। পিতা রমদারঞ্জন ও মাতা কুসুমময়ীর একমাত্র সন্তান। মাত্রাতিরিক্ত স্নেহে মাত্রাতিরিক্ত দুরন্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সন্তানের দস্যিপনা ক্রমবর্ধমান, লেখাপড়ায় অনাগ্রহ—এসব যখন ভাবিয়ে তুলছিল, সে-সময় আকস্মিক চরম বিপর্যয় নেমে আসে মিত্র মজুমদার পরিবারে। দক্ষিণারঞ্জনের মাতৃবিয়োগ ঘটে। বছর ন'য়েক তখন তাঁর বয়স, কত বড়ো বিপর্যয় ঘটে গেল! অপরিণত বয়সে তা বুঝে ওঠার আগেই অবশ্য স্নেহময়ী পিসিমাকে পাশে পেয়েছিলেন।

পিসিমা রাজলক্ষ্মী চৌধুরানী ছিলেন বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী, যথেষ্ট বিত্তশালিনী। অর্থই তো জীবনে সব নয়। স্বামী অকালে প্রয়াত হয়েছিলেন, নিঃসন্তান তিনি। ফলে তাঁর সব থেকেও যেন কিছুই ছিল না। নিয়ত মনোযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। সেই বেদনাবহ জীবনে আনন্দসিঞ্চন করেছিলেন বালক দক্ষিণারঞ্জন। কী অমোঘ শক্তি! বালকটির সান্নিধ্যে ভরে উঠেছিল তাঁর দুঃখদীর্ণ মন।

বাল্য থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত দক্ষিণারঞ্জনের দিঘাপতিয়াতে কেটেছে, পিসিমার স্নেহছায়ায়। শৈশব-বাল্যে মা কুসুমময়ী দেবীর কাছে রূপকথার গল্প শুনে যে ভালোলাগা,

আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, তা পিসিমার স্নেহসান্নিধ্যে উত্তরোত্তর বেড়েছিল। পিসিমা নিয়ম করে প্রতিদিনই প্রায় রূপকথার গল্প শোনাতেন দক্ষিণারঞ্জনকে। রূপকথার প্রতি প্রথমে মা, পরে পিসিমা ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। সেই ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। অন্তর উৎসারিত ভালোবাসার টানেই তো অনাদৃত-অবহেলিত রূপকথার গল্পসম্ভার উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। লেখা হয়েছিল 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো চিরায়ত-চিরকালীন গ্রন্থ। দক্ষিণারঞ্জনের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুব কম নয়। রূপকথা-লোককথার বইয়ের বাইরে আরও কয়েকটি বইয়ের কথা বলতেই হয়। যেমন 'চারু ও হারু', 'ফার্স্ট বয়', 'আমার বই', 'উৎপল ও রবি', 'কিশোরদের মন', 'বাংলার সোনার ছেলে' ও 'আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী'। সমকালে বইগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু 'চিরায়ত' হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে থাকার জন্য দক্ষিণারঞ্জনের ওই একটি বই-ই যথেষ্ট। সেটি যে 'ঠাকুরমার ঝুলি' তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রথাগত পড়াশোনার শুরু ঢাকা জগন্নাথ কলেজিয়েট স্কুলে। একটু বেশি বয়সে ভরতি হয়েছিলেন সপ্তম শ্রেণিতে। পরে সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুলে। ছাত্র জীবনে প্রায়শই থাকতে হয়েছে স্কুল-বোর্ডিঙে। পিসিমার সাক্ষাৎ-সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেও স্নেহসুধায় ঘাটতি পড়েনি।

দক্ষিণারঞ্জন তখন একুশে পরিপূর্ণ যুবক। সে-সময় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাঁকে আসতে হয় পিতার কাছে, মুর্শিদাবাদে। প্রথানুসারী পড়াশোনায় তাঁর কোনোকালেই আগ্রহ ছিল না। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে এফ. এ. পাঠকালীন এই অনাগ্রহ থেকেই তাঁর কলেজীয় শিক্ষা-জীবনে ঘোষিত পরিসমাপ্তি ঘটে। চলে নিজের মতো করে ভিন্নতর পড়াশোনা। পিতা রমদারঞ্জন ছিলেন কাব্যপ্রাণ মানুষ। বাড়িতে ছিল বিপুল বইয়ের সংগ্রহ। দক্ষিণারঞ্জন ডুব দিয়েছেন ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বিচিত্র গ্রন্থসম্ভারে। পিতার কাব্যপ্রীতি তাঁর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। অচিরেই কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। প্রকাশ করেছেন 'সুধা' নামে একটি পত্রিকাও।

অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন দক্ষিণারঞ্জন। প্রতি মাসে কলকাতায় এসে ছাপিয়ে নিয়ে যেতেন 'সুধা'। যতই পরিশ্রম হোক না কেন, এর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। নিজের মতো করে তৈরি করেছিলেন আনন্দময় এক কাব্যজগৎ।

হঠাৎই ঘোরতর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয় দক্ষিণারঞ্জনকে। প্রয়াত হন পিতৃদেব। শোকধ্বস্ত দক্ষিণারঞ্জনকে শেষে নিরুপায় হয়েই ফিরে যেতে হয় পিসিমার কাছে।

টানা পাঁচ বছর কাছে পাননি, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আবার কাছে পেয়ে পিসিমা বড়োই আহ্লাদিত হয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনকে কাজ দিয়েছিলেন জমিদারি-পরিদর্শনের। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাটির টানে পরিভ্রমণ। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন মোড় নিল। বলা যায়, মনোরম প্রকৃতি ও প্রাণময় মানুষের সান্নিধ্যে দক্ষিণারঞ্জন নিজেকে আবিষ্কার করলেন। নিজের কাছের জগতটি উন্মোচিত হল। মানুষের মুখে

মুখে ছড়িয়ে আছে এত গল্প, এই বিস্ময়-সংবাদ তাঁকে আলোড়িত করল।

ছড়িয়ে থাকা গল্পের মহার্ঘতা বুঝতে দেরি হয়নি দক্ষিণারঞ্জনের। সংগ্রহ আর সংরক্ষণ যে জরুরি, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। শুধু উপলব্ধি নয়, এরপরই শুরু হয়েছে তৎপরতা। ছড়িয়ে থাকা রূপকথার গল্পমালা উদ্ধারে সক্রিয়তা। বড়ো আন্তরিক সে-উদ্যোগ।

লোকসাহিত্যের প্রতি বৃহত্তর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে প্রয়াসী হয়ে দক্ষিণারঞ্জন যথার্থ অর্থেই এক স্বাদেশিক কর্তব্য পালন করলেন। সাধারণ জনের কণ্ঠে শ্রুত গল্পগুলি অবিকৃতভাবে ফোনোগ্রামের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে তুলে রাখলেন। শুধু রেকর্ড করে রাখা নয়, গল্পগুলি লিপিবদ্ধও করলেন। এইসব গল্প নিয়েই তৈরি হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র পাণ্ডুলিপি। নিজের হাতে গল্পগুলির ছবিও আঁকলেন। সেসব নিয়ে কলকাতায় এলেন ১৯০৬ সালে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তখন শহর উত্তাল। চলেছে বিদেশি বর্জন, স্বদেশি গ্রহণ। বঙ্গনারী তখন বিলেতি রেশমি চুড়ি খুলে ফেলেছে, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিয়েছে সবাই। স্বাদেশিক প্রেক্ষাপটে খাঁটি স্বদেশি সম্পদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। সত্য যে কঠিন, অনেক আশা নিয়ে কলকাতায় এসে নিরাশ হলেন তিনি। কোনো প্রকাশকই ছাপতে চাইল না 'ঠাকুরমার ঝুলি'। সে সময় মহানুভব আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সুপণ্ডিত দীনেশচন্দ্র লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ পোষণ করতেন। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। জহুরি জহর চেনে, দীনেশচন্দ্র চিনলেন দক্ষিণারঞ্জনকে।

দক্ষিণারঞ্জন তাঁর কাছে অবশ্য উপযাজক হয়ে যাননি, তিনিই এসেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যা) দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। সেই প্রবন্ধ পড়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবি হরি দত্তের পুঁথির অন্বেষণে দক্ষিণারঞ্জনের কুমারটুলির বাড়িতে এসেছিলেন অনুসন্ধিৎসু গবেষক দীনেশচন্দ্র। টেবিলে রাখা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে একটু পরেই অভিভূত হয়ে পড়েন। কৌতূহলী হয়ে দীনেশচন্দ্র জানতে চান বইটি কবে বেরুচ্ছে, কারা প্রকাশ করছে! দক্ষিণারঞ্জন জানান দুঃখের কাহিনি। কোনো প্রকাশকই এ-বই ছাপতে রাজি হয়নি। ঠিক করেছেন, নিজেই ছাপবেন। তাই বাড়ির পাশেই পিসিমার আর্থিক সাহায্যে প্রেস খুলেছেন।

শুনে স্তম্ভিত দীনেশচন্দ্র। 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশ নিশ্চিত করতে তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেন। নামী প্রকাশন সংস্থা 'ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স'কে বইটি ছাপতে অনুরোধ করলেন। অচিরেই দক্ষিণারঞ্জনের আঁকা চিত্রমালায় সজ্জিত হয়ে, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হল 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

'ঠাকুরমার ঝুলি'-র এই যে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখেছেন, অনুজ লেখকের মহতী প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আড়ালে ওই দীনেশচন্দ্র। তিনিই 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র

পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, ভূমিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে কবির পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ির 'ভারতী' পত্রিকার তখন সম্পাদন দায়িত্বে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর সঙ্গেও দক্ষিণারঞ্জনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই 'ভারতী'-র জন্য গল্প দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। গল্পের নাম 'পুষ্পমালা'। ছাপা হয়েছে তিন কিস্তিতে, ধারাবাহিকভাবে (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৫)। আসলে দীনেশচন্দ্র এগিয়ে না এলে 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র প্রকাশ ত্বরান্বিত হত কিনা—এ প্রশ্ন রয়েই যায়।

রবীন্দ্র-স্বীকৃতি নিয়েই তো 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র প্রকাশ, বইটি হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন দেশের স্মরণীয়-বরণীয় মনীষীদের অনেকে। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, 'The book has marked out an epoch in our literature...This is sure to give him a prominent place in the rank of prominent poets and writers.'

এমনই আরও আ-র-ও সপ্রশংস মন্তব্য, দক্ষিণারঞ্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সকলে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থভুক্ত ভূমিকায় প্রথম পঙ্‌ক্তিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ঠাকুরমার ঝুলির মতো এত বড়ো স্বদেশি জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?' বলাই বাহুল্য, সে-সময় এই প্রশ্নের না-বাচক উত্তরই সংগত ছিল।

স্বদেশপ্রেম, গভীর স্বাদেশিকতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই দক্ষিণারঞ্জন 'স্বদেশি জিনিস' উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। সারা দেশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে তখন অগ্নিগর্ভ। উত্তপ্ত ও উত্তাল দেশের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করার তাগিদে রচিত হয়েছে কত না সাহিত্য! কবিতা-গান-নাটক-প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেম জাগাতে, স্বাদেশিকতায় উদ্‌বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন কবি-লেখকরা। সেই পরিস্থিতিতে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো 'এতো বড়ো স্বদেশি জিনিস' যে পাঠক সমাজে স্বীকৃতি পাবে, এ তো স্বাভাবিক! ঘটেছেও তাই। দক্ষিণারঞ্জনের এই স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতাবোধ কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। দেশের প্রতি ভালোবাসা, দায়বদ্ধতার নজির 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রকাশের আগে পরে সবসময়ই দক্ষিণারঞ্জনের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। সম্পাদিত পত্রিকা 'সারথি'তে প্রকাশিত তাঁর লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধে পূর্বেই গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র সংগ্রহকর্মে যখন ব্যস্ত, সে সময় তিনি বহু স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা-গান রচনা করেছিলেন। সেগুলিও যথেষ্ট সমাদৃত হয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র প্রকাশের পরের বছরই এইসব গান-কবিতা নিয়ে 'মা বা আহুতি' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র সূচনায় 'নিবেদন'-অংশে দক্ষিণারঞ্জন অতীত-কাতরতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। ফিরে গিয়েছেন ছেলেবেলায়। অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত; কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর তা'রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে শুনিতে, চোখ বুজিয়া আসিত;—সেই অজানা রাজ্যের সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তের

নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত, আমার মত দুরন্ত শিশু! ---শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।'

তবু রূপকথার নটেগাছ মুড়োয় না। আপাতভাবে গল্প হয়তো ফুরোয়, রেশ তো রয়েই যায়। যেমন ছিল দক্ষিণারঞ্জনের মনে। 'নিবেদন'-অংশেই তিনি জানিয়েছেন : 'মা'র মুখের অমৃত-কথার শুধু রেশগুলি মনে ভাসিত; পরে, কয়েকটি পল্লীগ্রামের বৃদ্ধার মুখে আবার যাহা শুনিতে শুনিতে শিশুর মত হইতে হইয়াছিল, সেসব ক্ষীণ বিচ্ছিন্ন কঙ্কালের উপরে প্রায় এক যুগের শ্রমের ভূমিতে এই কুল-মন্দির রচিত। বুকের ভাষার কচি পাপড়িতে সুরের গন্ধের আসন, কেমন হইয়াছে বলিতে পারি না।'

খুব সঙ্গত কারণেই 'ঠাকুরমার ঝুলি' নিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের দ্বিধা-সংশয় ছিল। তিনি যে অরূপরতনের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা আচার্য দীনেশচন্দ্র প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। কতখানি মহার্ঘ, তা আমাদের বৃহত্তর পাঠক সমাজকে বুঝিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে এ বইয়ের সম্পদ।

'স্নেহময়ীদের মুখের কথা' বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র প্রতিটি গল্পে। শব্দে শব্দে জীবন্ত হয় কল্পলোকের গল্পকথা। দক্ষিণারঞ্জন গল্পগুলিকে আরও দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। পাতায় পাতায় তাঁর নিজের আঁকা ছবি, শব্দের ছবি, রং তুলির ছবি—প্রকৃত অর্থেই 'ঠাকুরমার ঝুলি' 'চিত্ররূপময়'।

'ঠাকুরমার ঝুলি'-র উৎসর্গপত্রে দক্ষিণারঞ্জন লিখেছিলেন, 'ঠাকুরমা'র বুকের মাণিক, আদরে খোকা খুকি/ চাঁদমুখে হেসে, নেচে নেচে এসে, ঝুলির মাঝে দে উঁকি!' উঁকি দিয়ে সত্যি আমাদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না! অপরূপ রূপকথার যে-ডালি দক্ষিণারঞ্জন আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। শিশুরা তো কল্পনাপ্রবণ! 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র গল্পে ডুব দিলে অবুঝ-সবুজ মন মুহূর্তে পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে পৌঁছে যায় 'সব পেয়েছির দেশে'। দুঃখ নেই সেখানে, দৈন্য নেই, শুধুই আনন্দ। ছোটোদের নয়, এই আনন্দজগতে সবার নিমন্ত্রণ। বড়োরা ফিরে পায় ছেলেবেলা। 'ছোট্ট'টি হয়ে চলে আনন্দ-উপভোগ। সেই আনন্দ সমারোহে কোনো কোনো গল্পকথায় তাঁরা অবশ্য খুঁজে পান গভীরতাময় ভিন্নতর অর্থ। রূপকথার ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি নতুন করে টের পাওয়া যায়।

তিনটি পর্যায়ে গ্রন্থিত হয়েছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র গল্পসমূহ। 'দুধের সাগর' পর্যায়ে রয়েছে ছয়টি গল্প। ক্রমান্বয়ে মুদ্রিত হয়েছে 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্তপুরী', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'শীত-বসন্ত' ও 'কিরণমালা'। 'রূপ-তরাসী' পর্যায়ে গল্প-সংখ্যা কমেছে। সব মিলিয়ে চারটি। ক্রমান্বয়ে রয়েছে 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' ও 'সোনার কাটি রূপার কাটি'। তৃতীয় পর্যায় 'চ্যাং-ব্যাং'-এও রয়েছে চারটি গল্প, ক্রমান্বয়ে 'শিয়াল পণ্ডিত', 'সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী' ও 'দেড় আঙ্গুলে'। উল্লিখিত এই তিন পর্যায়ে গল্পগুলি গ্রন্থিত করার পর 'আম-সন্দেশ' শিরোনামে দক্ষিণারঞ্জন তিনটি ছড়া রেখেছেন। ছড়াগুলিও লোকায়ত,

সংগৃহীত। শেষ পাতায় 'ফুরাল' নামে চিরচেনা সেই ছড়াটি ছাপা হয়েছে, 'আমার কথাটি ফুরাল, /নটে গাছটি মুড়াল।'

তিন পর্যায়ে চোদ্দোটি গল্প সংকলিত হয়েছে 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। গল্পে রাজা-রাণীর কথা যেমন আছে, তেমনই আছে সাধারণজনের কথা। বিলাস-বৈভবের পাশাপাশি দুঃখের বারোমাস্যা। দুঃখের কথা উঠলেই আমাদের হয়তো মনে পড়ে যাবে দুখুর কথা। এক তাঁতির দুই স্ত্রী। দু'জনের দু'টি মেয়ে, সুখু ও দুখু। তাঁতির যত আনুগত্য তা ওই বড়ো বউ আর তার মেয়ে সুখুর প্রতি। ছোটো বউ আর দুখুর প্রতি শুধুই অবহেলা। দুখু ও তার মা'র দুঃখ-দুর্গতির কথা দক্ষিণারঞ্জন শুনিয়েছেন। দুঃখ-দুর্গতিতেই অবশ্য গল্প ফুরিয়ে যায়নি।

রূপকথায় প্রায়শই থাকে নৈতিক শিক্ষা। ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পেও রয়েছে নৈতিকশিক্ষা, শুভবোধ জাগ্রত করার আন্তরিক প্রয়াস। 'সুখু আর দুখু' গল্পের পরিসমাপ্তিটি স্পষ্টতই নীতিবাচক। রূপকথার গল্পে এ ধরনের পরিসমাপ্তিই যে মানানসই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী' বা দেড় আঙ্গুলে'—কোনো গল্পেই রাজ-বৈভব নেই। শৌর্য-বীর্য নেই। 'দেড় আঙ্গুলে' গল্পের নায়ক অতীব ক্ষুদ্রকায়। গল্পটি পড়তে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা'-র কথা মনে পড়ে যেতে পারে। 'বুড়ো আংলা' অবশ্য অনেক পরে লেখা। 'বুড়ো আংলা' সুইডিশ লেখিকা Selma Lagerlof-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এ-বইটি 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সমকালীন বাংলার লোকগল্প সুইডেন ঘুরে আবার ফিরে এসেছে অবনীন্দ্রনাথের কলমে, কে জানে!

সন্তানহীনতা, সন্তানলাভের আকুলতা, শেষে সন্তানলাভ—এসব রূপকথার গল্পের চেনা বিষয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তেও তা রয়েছে। 'কলাবতী রাজকন্যা' নামের গল্পে দেখি, 'রাজার মস্ত-বড় রাজা'; প্রকাণ্ড রাজবাড়ী। হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাণ্ডারে মাণিক, কুঠরীভরা মোহর, রাজার সব ছিল। ...কিন্তু, রাজার মনে সুখ ছিল না। সাত রাণী, এক রাণীরও সন্তান হইল না। রাজা, রাজ্যের সকলে, মনের দুঃখে দিন কাটান।' 'সাত ভাই চম্পা' নামের গল্পটিতে সন্তানহীনতা ঘিরে যন্ত্রণার কথা তো আছেই, সেই দুঃখ ম্লান হয়ে যায় সন্তান-লাভের আনন্দে। গল্পে রয়েছে : 'অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করিবে? রাজা মনের দুঃখে থাকেন। এইরূপে দিন যায়। কতদিন পরে,—ছোটরাণীর ছেলে হইবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না, পাইক পিয়াদা ডাকিয়া রাজা রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, —রাজা রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, মিঠাইমণ্ডা, মণি-মাণিক যে যত পার, আসিয়া নিয়া যাও।'

না, রাজার অভীষ্ট লাভ এত সহজে হয়নি। অন্য রানিরা লিপ্ত হয়েছে চূড়ান্ত দুষ্কর্মে। 'চাঁদের পুতুল'-এর মতো সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিয়েও সন্তান-সুখ তো দূরের কথা, অন্য রানিদের কারসাজিতে জুটেছে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, দুর্ভোগের

অন্ত থাকেনি তাঁর। 'পোড়াকপালী ছোটরাণী'র সীমাহীন যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। উদঘাটিত হয়েছে সত্য, পরাভূত হয়েছে মিথ্যা। ষড়যন্ত্রী রানিরা উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বেজেছে, ছোটোরানির মুখে হাসি ফুটেছে।

এক পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথার ফলে এভাবে সতীনদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের সম্পর্ক, সে-সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক কারণও আছে। গল্পে গল্পে সহজলভ্য নারীমনের কুটিলতা, জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ সবেরই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। কখনো নারীকে মনে হয় ধ্বংসকারিণী, কখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার কল্যাণ-রূপ। 'কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালা' গল্পে এই দুই রূপই স্পষ্ট। আবার সখ্য-স্মারকও বটে। গল্পটি পড়তে পড়তে বন্ধুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মন ভরে ওঠে। গল্পের অন্তিমে দেখি, 'রাজা গলাগলি করিয়া মন্ত্র-বন্ধুর বাঁশী শোনেন।' চাঁদের আলোয় তখন আকাশ ভরে যায়, নদীর ধারে গাছের তলার বংশীধ্বনিতে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। চারপাশে এখন ভাঙাচোরা সম্পর্ক, সম্পর্কহীনতাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় গল্প আমাদের ভিন্নতর শিক্ষা দেয়। জীবনে নানাস্তরের প্রয়োজনীয় শিক্ষা রূপকথার গল্পে, 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র গল্পে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই ঝলকে ওঠে। আদরে সাদরে তা গ্রহণ করার দায় আমাদের।

এইসব গল্পের কোনো কোনো চরিত্র মাঝেমধ্যেই আদর্শায়িত হয়ে ওঠে। কখনো হয়তো লক্ষ করা যায় ভয়াবহ হিংস্রতা, কখনো বা অনুকরণযোগ্য ঔদার্য। রাজা রাজড়াদের অনেক কর্মকাণ্ডই সমর্থনযোগ্য নয়, আবার কারও কারও কর্মকাণ্ডে আমরা পুলকিত হই, বাহবা দিই। কিরণমালা গল্পের রাজা 'দিনের বেলায় মৃগয়া করেন—হাতীটা মারেন, বাঘটা মারেন; রাত হইলে রাজা ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখেন।' এভাবে কোনো কোনো রাজার কর্মকাণ্ড, মানসিকতা, বিক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম আদর্শায়িত হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছে 'কিরণমালা' গল্পে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির যতই বাড়বাড়ন্ত হোক না কেন, রূপকথার এখনও অমোঘ আকর্ষণ। এ আকর্ষণ চিরকালীন। শিশু তো বদলায় না। যেটুকু অদল-বদল, তা উপর-উপর। ভেতরে একই রকম। 'সর্ব প্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও তেমনি আছে।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের বাস্তব সত্যতা আছে বলেই 'মিত্র ও ঘোষ' 'চত্বিংশৎ সংস্করণ'-এ 'ঠাকুরমার ঝুলি' যে মুদ্রণ-পরিসংখ্যান দেয়, তা আমাদের অভিভূত করে। মুদ্রণ-সংখ্যাটি যথেষ্ট বৃহৎ, 'এক লক্ষাধিক সাতানব্বই সহস্র'। এখন কপিরাইট না থাকায় 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র মুদ্রণ সংখ্যা যে সহস্র গুণ বেড়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

'ঠাকুরমার ঝুলি'-র এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের জাদুকরি গদ্যভাষা। গল্প-বুননে তাঁর প্রশ্নাতীত নৈপুণ্য। প্রতিটি গল্প কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। মনে হয়, পাশে বসে কেউ গল্প বলে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো গ্রন্থ-ভূমিকায় বলেইছেন: 'দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি 'ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন

তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।' 'মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে' তুলে ধরা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও আসলে সহজ নয়। সহজ কথা যায় না বলা সহজে। 'কেতাবি ভাষা'য় আর যাই হোক, রূপকথার গল্প লেখা সম্ভব নয়। দক্ষিণারঞ্জন দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে, অনায়াসে দক্ষতায়। দক্ষিণারঞ্জনের এই সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণারঞ্জনের গল্প কতখানি মুগ্ধ করেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই মন্তব্যে, 'আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না'।

সাধু গদ্য দক্ষিণারঞ্জনের হাতে স্বাদু হয়ে ওঠে। গদ্যের মাঝে ছন্দ-মিল, পদ্যের অনুপ্রবেশ বড়োই শ্রুতিসুখকর। শব্দ-ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জন সমান সচেতন। অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত ও ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে তাঁর গদ্যভাষায় এসেছে এক স্বতন্ত্র মাধুর্য। শব্দের পৌনঃপুনিকতায় কখনো ছবি হয়ে ওঠে। লক্ষ করি, 'যাইতে' শব্দটি বার চারেক ব্যবহার করে আশ্চর্য দক্ষতায় দক্ষিণারঞ্জন পথের দীর্ঘতা স্পষ্ট করে তোলেন।

দক্ষিণারঞ্জন আজও অননুকরণীয়, আকর্ষণীয়। তাঁর রূপকথার মায়াবী জগতের কাছে আমাদের বার বার ফিরে ফিরে যেতে হয়। রূপকথার নটেগাছ মুড়োয় না, গল্পও ফুরোয় না। ছোটোরা সে-জগতের সন্ধান পেলে, তারাও যাবে, আনন্দে আপ্লুত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।